শ্রী অরবিন্দ ও অতিমানস শক্তি

হেমন্ত প্রধান

১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসাবে টি.ভি. বা রেডিওতে প্রচারের প্রাক্কালে, আবার এই দিবসটি শ্রী অরবিন্দের জন্ম দিবস বলে প্রচারের সময় প্রায়ই শোনা যায় শ্রী অরবিন্দ (কখনো কখনো অরবিন্দ ঘোষ) একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। পরে রাজনীতি ছেড়ে পণ্ডিচেরীতে যোগে মনোনিবেশ করেছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে তাঁর জন্মসার্দ্ধশতবর্ষের দিকে এগোলেও শ্রী অরবিন্দের মূল অবদান সম্পর্কে এখনো ভারতবাসী কিছুই জানলো না।

শ্রী অরবিন্দ পৃথিবীতে এসেছিলেন এক নতুন কাজ নিয়ে — পৃথিবীতে অতিমানস শক্তির অবতরণ। এই শক্তির ধারণা হয়তো সম্পূর্ণ নতুন নয়। তাঁরই মতে এই ধারণা বৈদিক ঋষিদের কারোর কারোর গোচরে ছিল। তবে পৃথিবীর প্রয়োজনে এর প্রয়োগ তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। এই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তিনি কিভাবে পেলেন। অন্যান্য সাধকদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য বা ডারউইনের ক্রমবিকাশের তত্ত্বের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য, শেষে শ্রীমা, তার সহযোগী সাধিকা — তাঁর শেষ জীবনের সাধনার সূত্র ধ'রে এই অতিমানস শক্তির বর্তমান অবস্থান মানসিকভাবে যতখানি তুলে ধরা যায় — তাই করবো।

ছাত্রাবস্থায় ইংল্যান্ডে গিয়ে ছাত্ররা যা করে — অভিনিবেশ সহকারে পড়াশুনা, বিভিন্ন বিষয়ে বুৎপত্তি লাভ — সবই করেছেন তিনি। ফাঁকে ফাঁকে আধ্যাত্মিক অনুভূতিও পেয়েছেন। ভারতে এসেই তার পূর্ণ উন্মেষ হ'লো। সাধনপথে শ্রী অরবিন্দের অনুভূতিগুলো অধিকাংশই অপ্রত্যাশিতভাবে এসেছে। একজন মহারাষ্ট্রীয় ভক্তের সঙ্গে ধ্যানে বসে, যে ভক্ত অদ্বৈত বেদান্তকে পছন্দ করতো না, তিনি অদ্বৈত পরব্রহ্মাণের উপলব্ধি লাভ করলেন। পৃথিবীটাকে মনে হ'ল পরব্রহ্মাণের নৈর্বক্তিক সর্ব্বব্যপিতায় কিছু শুন্য-গর্ভ ছবির চলচ্চিত্র। শ্রী অরবিন্দের ভাষায়, **"The world is a cinematographic play of vacant forms in the impersonal universality of the Absolute Brahman."**

শ্রী অরবিন্দ নিজেই বলেছেন নির্বানের উপলব্ধি তাঁর জীবনের প্রথম সদর্থক আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। মহারাষ্ট্রিয় সাধক বিষ্ণু ভাস্কর লেলের তত্ত্বাবধানে তিনি নির্বান তিনদিনে লাভ করেছিলেন। সাধনায় বসে তিনি দেখলেন, যেমন লেলে বলেছিলেন, তাঁর চিন্তাগুলি বাইর থেকে তাঁর ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। তিনি একটা একটা করে চিন্তাগুলোকে বাইরে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন। এ রকম দু'দিন করতে বাস্তবিক পক্ষে তৃতীয় দিনে নির্বানের উপলব্ধি পেয়েছিলেন। তিনি বলছেন — আমার সামান্যতম ধারণা ছিল না এ সম্পর্কে, এমনকি এর জন্য কোন আস্পৃহাও ছিল না। নির্বান সম্পর্কে শ্রী অরবিন্দ বলেছেন — শুন্যগর্ভ বস্তু সম্ভারে ভরা এক স্থুলীভূত ছায়া **(unaterialised shadows without true substance)** । সেই শুন্যতা ছাড়া আর কিছু ছিল না। তাঁর ভাষায় **(Absolutely Tlhat, featureless retationless, sheer, indescribable, unthinkable, absolute, yet supremely real. ... It was positive the only positive reality, although not a spatial physical world, pervading, occupying or rather flooding drowning this semblence of physical world leaving no room or space for any reality but itself, allowing nothing**

else to seem at all actual, positive or substantial)। নির্বান সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা খুবই প্রাণবন্ত। আমি নির্বান সম্পর্কে এই বর্ণনাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছি এই জন্য যে নির্বান অনুভূতির ভিতরেই বুদ্ধের ঈশ্বর-হীনতা নিহিত। শংকর বা অন্যান্য সাধকদের মায়াবাদের জন্ম নির্বান বা তার থেকে কিছু কম শক্তিশালী উপলব্ধিই দায়ী।

তা সত্বেও এখানে নয়, এর পরেই আসছে শ্রী অরবিন্দের উপলব্ধির আসল পরিচয়। এই অনুভূতিতে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে, পরে তিনি এসেছিলেন তাঁর নিজস্ব উপলব্ধিতে — অতিমানস শক্তিতে, নির্বান যাকে রাস্তা করে দিয়েছিল তাঁর চেতনায়। তাঁর ভাষায়

"An aspect of an elusitionery world gave place to one in which illusion is only a small surface phenomenon with an immense Divine Reality behind it and a Supreme Divine Reality in the heart of everything that had Semed at first only a cinematic shape or shadow... It came as a constant heighening and Widening of Truth. It was the spirit that sad the abject, not the senses."

নির্বান যদি পৃথিবীকে একটা শুন্যগর্ভ অর্থহীন বস্তু করে তুলেছিল, নির্বানোত্তর আরো শক্তিশালী ক্রমপুঞ্জিত শক্তির উপলব্ধি তাঁকে অতিমানস শক্তির ধারণার দিকে নিয়ে গেল। তিনি বুঝলেন এই শক্তি, অমোঘ, অনিবার্য্য, অপ্রতিরোধ্য, সাবলীল। মানুষের দূরপমেয় কলঙ্ক দুর করে আর একশ্রেণীর দেবতাপদবাক্য জীবের অভ্যুদয় ঘটাবে তিনি বুঝতে পারলেন। ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী দিনটি পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঘন-অস্থিষ্ট নিশ্চেতন — যেমন একটি পাথর খণ্ড — তার থেকে চেতনার ক্রমবিকাশ শুরু হল কিছু সবুজ শ্যাওলার আকারে ইতস্তত ভাসমান জলে, বন্য গাছের পাতায় ফুলে, পরে জীবজন্তুতে বানরের গাছের ডালে বসে বিবিধ কলা কৌশলে এবং পরিশেষে যা প্রসারিত হ'ল মানুষের শরীরের সুষম গঠনে, মস্তিস্কের ওজন ও বিচার-বিশ্লেষণে, তারই চূড়ান্ত পরিণতি ঘটতে চলেছে অতিমানসিক শক্তিধারী এক জীবনের বিকাশে। আমার মনে হয় এই দিনটির জন্য পৃথিবী অপেক্ষা করেছে সেই সভ্যতার আদিম প্রভাত থেকে। সেই দিনটি এসে গেল পৃথিবীতে অতিমানস শক্তির অবতরনে ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারীতে।

অবিশ্যি এই ঘটনার জন্য কারোর কৃতিত্বের বিচারে যাওয়া বৃথা। কেননা, পণ্ডিচেরীর শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের কোন কোন সাধক তাঁর অতি মানস শক্তির প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের আগে শ্রী অরবিন্দকে স্থান দিতে চেয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে শ্রী অরবিন্দ নিজেই বলেছেন, **"You cannot expect me to argue about my own spiritual greatress in comparison with Krishn's."** পরে তিনি বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সাধনার পথে পথ-প্রদর্শক ছিলেন। আলিপুরের মামলায় বিচারকালে তিনি সর্বত্র কৃষ্ণকে দেখেছেন। বিচারক নিজে কৃষ্ণের রূপ নিয়ে আসনে আসীন। এমনকি শান্ত্রী যে দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে সেও শ্রীকৃষ্ণের আকার নিয়ে আছেন। তবে পৃথিবীর এই আধ্যাত্মিক উচ্চতায় পৌঁছানোর জন্য সকলেরই অবদান আছে। যিশুখৃষ্টের প্রেমের বাণী যদিও পৃথিবীকে পরিবর্তিত করতে পারেনি তবুও মানুষের মননে ধীর নিভৃত নিশ্চিত পরিনতির দিকে এগিয়ে দিয়েছে। বৈদিক যুগের ঋষিদের সাধনা যুগে যুগে মানস-পরিবর্তনের সুচনা করেছে। বুদ্ধের নিধান যদিও পৃথিবীটাকে মায়াবাদের ছায়া ছায়া অন্ধকার ঠেলে দিয়েছে তবুও নিধান অতিমানস সাধনার পথে উপরে ওঠার একটা ধাপ **(Stepping Stone)**। হজরৎ মোহম্মদের বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বাণীর মধ্যে মানুষকে তার অন্তর-নিহিত অনেক আবিলকে মুছে উচ্চতায় ওঠার সাহায্য করেছে। শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বাণী

মিথ্যা হয়নি। ত্রৈলঙ্গস্বামী ছিলেন কাশীর চলমান শিব। তাকে দেখে মানুষ বুঝেছে দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত আবিলতার পিছনে একটা শুচিতা আছে। তেমনি রামকৃষ্ণ, বামাক্ষ্যাপা, রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধক, বৈষ্ণব সাধক, যিনি ঘরে ঘরে দীক্ষা দিচ্ছেন তাঁদের দীক্ষামন্ত্রও মানুষের মনের প্রস্তুতিতে সাহায্য করেছে তা না হলে শ্রী অরবিন্দ-শ্রীমার সাধনায় ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী এত তাড়াতাড়ি আসত কি।

তবু বলি শ্রী অরবিন্দ পূর্বতন অন্যান্য সাধকদের কোন যোগিক সমাহার নন। শংকরের মত অনেক সাধকের মায়াবাদকে তিনি সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করেছেন। উদ্দেশ্য হিসাবে মোক্ষ লাভকে তিনি গুরুত্ব দেননি। পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি তাঁর সাধনায় নেই। শ্রী অরবিন্দের চেতনার অবতরণ এবং রূপান্তর (transformation) নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি আছে। রূপান্তরকে তিনি তিন পর্য্যায়ে নিয়েছেন। প্রথম হ'ল চৈত্যীয় রূপান্তর (Psychic transformation) যেখানে মানুষ ব্যক্তিগত চৈত্যীয় চেতনায় দীব্য সংস্পর্শ পেয়ে এক ধরনের রূপান্তর লাভ করে। দ্বিতীয় হ'ল আধ্যাত্মিক রূপান্তর (Spiritual transformation) যেখানে মহাজাগতিক চেতনায় (Cosmic Consciousness) ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্তির ফলে মানুষের রূপান্তর ঘটে। এই দু'ধরনের রূপান্তর পূর্বতন সাধকদের মধ্যে ঘটেছে। আর তৃতীয়টি শ্রী অরবিন্দের নিজস্ব, এইখানে তাঁর মৌলিকত্ব, — অতিমানসিক রূপান্তর (Supramental transformation) — দীব্য আধ্যাত্মিক চেতনায় মানুষের অস্তিত্বের সমস্ত বিভাগে একটা অখণ্ড সুসংহত রূপান্তর — যে রূপান্তরের বলে মানুষ দেবতা-পদ-বাচ্য অথবা দেবতাদের ও ঈর্ষনীয় অবস্থানে উঠে আসে।

ভারতের পূর্বতন সাধকদের মধ্যে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে, সেগুলো তাঁর ব্যক্তিগত যোগসিদ্ধি। একজন সাধক সূক্ষ্ম শরীরে ইংল্যান্ডে গিয়ে তাঁর পরিচিতের রোগ নিরাময় করলো। এটা তাঁর (সূক্ষ্ম শরীর ধারণ) ব্যক্তিগত যোগসিদ্ধি। সূক্ষ্ম শরীর কিন্তু মনুষ্য শরীরের অতিমানসিক রূপান্তর নয়। দেহের অতিমানসিক রূপান্তর এখনো অনেকখানি অনালোকিত। ভবিষ্যতের উপর ছেড়ে দেওয়া আছে। আর সেটা হবে যে প্রকৃতি আমাদের শরীরকে শেওলা থেকে বর্তমান মনুষ্য শরীরে নিয়ে এলে সেই প্রকৃতির স্বধর্ম-সুলভ কাজ।

অবতরণ নিয়েও বিভ্রান্তি আছে। তথাকথিত যোগিক পথে অবতরণ ঘটে না। আরোহন আছে। ধ্যানে সাধকরা নিম্নতর চেতনা থেকে উর্দ্ধতন চেতনায় আরোহন করেন। পরে উদ্ধতন চেতনা তার শরীরে অবতীর্ণ হয়ে (অবতরণের ফলে) অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটানো এরকম হয় না। আবার শ্রী অরবিন্দ অবতরণকে একটি বিশেষ ও ব্যাপক মর্মে গ্রহণ করেছেন। পৃথিবীতে মানুষ যখনো জন্মায়নি তখন উদ্ধতন লোক থেকে পার্থিব পর্য্যায়ে মানসিক শক্তির অবতরণ ঘটলো। শারীরিক পরিবর্তন হিসাবে বলা যায় সুস্পষ্টভাবে মস্তিষ্কের সৃষ্টি হল। অতিমানসিক অবতরণে মানুষের যে পরিবর্তন ঘটবে মানসিক পরিবর্তন থেকে আরো ব্যাপক বৈশিষ্টপূর্ণ ও মৌলিক, যেখানে শরীরের খাদ্য গ্রহণ, যৌন আবেদনে সাড়া দেওয়া বা রক্ত সঞ্চালন শ্বাসগ্রহণ ইত্যাদি কাজের জন্য যে শরীর যন্ত্রের দরকার পড়ে সেগুলো কিছু থাকবে না — সেই যে রূপান্তর যেটা রূপান্তরের শেষ পর্যায় — সেটা অতিমানস রূপান্তরের অংশ। আবার অধিকাংশ সাধকের তিনি যতই মহান হোক না কেন যে পরিবর্তন এসেছে তা অধ্যাত্ম-মানসিক পর্য্যায়ের। শ্রী অরবিন্দের অতিমানস অধ্যাত্ম পর্য্যায়ের উপরে। শ্রী অরবিন্দ বলেছেন কৃষ্ণের মন ছিল অধিমানসিক (Over mentalised),

রামকৃষ্ণের মন স্বতলব্ধ (intuitive), চৈতন্যের মন অধ্যাত্ম-চৈত্যীয় (spiritual psychic), বুদ্ধের মন উচ্চ-মানসিক (higher mental)। প্রানিক (vital) সম্পর্কে বলতে গেলে রামকৃষ্ণের প্রানিক ছিল শিশু-সুলভ, জড়ভরতের প্রানিক ছিল জড়-সুলভ। কারোর কারোর প্রানিক পাগলের মত। আবার রামপ্রসাদের 'মায়ের কোল' বাহ্যিক মায়ের কোল নয়। সূক্ষ্ম শরীরের এ একটা অনুভব। এতে অতিমানসিক রূপান্তরের কিছু নেই।

সাধনায় বসে শ্রীঅরবিন্দের কোন উচ্চশিক্ষা ছিল না। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে নির্বান তিনি পেয়েছিলেন, কোন আকাঙ্খা ছিল না। মানুষ বড় অক্ষম, শক্তিহীন। মানুষের বা দেশের কিছু মঙ্গল করার জন্য কিছু ঐশ্বরিক ক্ষমতা চেয়েছিলেন। নির্বানের কোন ধারণা তাঁর ছিল না। তিনি তো পৃথিবী বিমুখ মন। মায়াবাদ পছন্দ নয়। কিন্তু নির্বানোত্তর বেশকিছু উপলব্ধি হুড়মুড় করে তাঁর মধ্যে এসে পড়তে তিনি অবাক হয়ে যান। সহযোগী সাধক তাঁর কথা শুনে তাঁকে অপদেবতায় ধরেছে বলে ত্যাগ করে চলে গেল। কিন্তু পরবর্তী সেই শক্তিশালী ক্ষমতা দেখে তিনি বুঝলেন এতে মানুষের বিপুল পরিবর্তন আসবে। তিনি বুঝলেন যেমন মানসশক্তি পৃথিবীতে নেমে এসে চিন্তাশীল মানুষ সৃষ্টি করেছিল, তিনি ভাবলেন এই শক্তি ক্রিয়াশীল হ'লে এক ভিন্নতর মানুষ মানুষ স্বাভাবিকভাবে জন্মাবে যার সঙ্গে দেবতাদের তুলনা করা যাবে। বলা যায় তখন মানুষের ভিতর থেকে অনেক জিনিস চলে যাবে এবং আসবেও অনেক জিনিস। তা হ'লো :

১) প্রচলিত খাদ্য গ্রহণ — এই যে ভারী খাদ্য নিত্য গ্রহণ করতে হয় তা আর হবে না। ফুলের একটু আঘ্রান নিলেই হয়তো খাওয়ার কাজ হবে। প্রচলিত অর্থে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলীর প্রয়োজন থাকবে না পরিবর্তে এক শক্তির দ্বারা দেহ পরিচালিত হবে।

২) প্রচলিতভাবে মাতৃগর্ভে শিশুর জন্ম হয় — সেই ভাবে অতিমানস শক্তিত্বর জীব আসবে না। সেই অর্থে মাতৃশরীরে যৌনাঙ্গ বা যৌনচেতনাও অর্থহীন হয়ে পরিত্যক্ত হবে।

৩) এখন মানুষের অবস্থান পরিমিতভাবে একটা জায়গা জুড়ে। তখন কিন্তু মানুষ একই সময়ে দশ জায়গায় উপস্থিত থাকতে পারবে। সে ক্ষমতা হবে সহজাত ক্ষমতা। আরো আনুসঙ্গিক আরো অনেক ক্ষমতা মানুষের করায়ত্ত হবে। তবে এটা আর কল্পনার বিষয় নয়। ১৯৫৬ সালে ২৯শে ফেব্রুয়ারী এই শক্তি পৃথিবীতে নেমেছে। এখন আর সম্ভাবনার কথা নয়। অনুকুল জল ও হাওয়া পেলে বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় এই শক্তির অবতরণ ও সেই অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে। আমরা বুঝি আর না বুঝি, এমনকি আমরা চাই বা না চাই — আমরা অনুমান আমাদের শ্বাস গ্রহণে সেই শক্তির সূক্ষ্ম কণা গ্রহণ করে চলেছি। যখন আমরা আমাদের মনে এই শক্তি সম্পর্কে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব তখন তা ক্রিয়াশীল হবে।

তাই বটে। এই শক্তি ক্রিয়াশীল হবে তাদের মধ্যে যারা এই শক্তিকে চাইবে, এখনকার মানুষ বহুধা বিভক্ত। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অসন্তুষ্ট অথচ কি হ'লে ভালো হবে সে সম্পর্কে সচেতন নয়। এটা এই শক্তি ধারণের ব্যাপারে একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা। মানুষ বিশ্বাসই করতে চাইবে না। মানুষ দশ জায়গায় একই সময়ে উপস্থিত থাকতে পারবে এটা কি করে হয়। এটা অভাবনীয় যে, যে রাস্তায় আমরা দৈনিক বেরোচ্ছি বিভিন্ন প্রয়োজনে সেই রাস্তায় এক অতিমানসশক্তি সম্পন্ন মানুষের সঙ্গে এখন যাদেরকে আমরা দেবতা বলে পুজো করি তারা রাস্তায় নেমে এসে আলাপচারিতায় কিছুক্ষণ কাটাবে, শুধু সময় কাটানো

নয়, নিজেকে তাতে গৌরবান্বিত বোধ করবে তা মানুষের কল্পনার বাইরে। তা ছাড়া আবার কিছু মানুষ আছে নিজের ভিতরে আত্মতুষ্ট হয়ে অবস্থান করে — কোন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান সাধনায় মগ্ন, সে অন্য কিছু ভাবছে না, সে বেশ ভালোই আছে মনে করে। কেউবা সমাজসেবায় আত্মতুষ্ট। তার অন্য কিছু হওয়ার ভাবনা নেই। বিশাল সংখ্যার মানুষ তার নিজের প্রচলিত পরিধির বাইরে আসতে চাইবে না বা অতিমানস শক্তির ক্রিয়াকলাপ দেখে হয়তো আতঙ্কিত হবে। যে স্বামী-স্ত্রী সুখে নিজেদের ভিতরে একটা জগৎ গড়ে তুলে আত্মমগ্ন তারা আসতে চাইবে না।

তবে এও একটা কথা যে সবাই না এলেও চলবে। ১৯৫৬ সালে এই শক্তি যখন নামলো তখন আশ্রমের কয়েকজন, আশ্রমের বাইরে অতি অল্প ক'জন এটা বুঝেছিল — তারা নিজেদের সাধনার বলে অতিমানস শক্তির উচ্চতর স্তরে পৌঁছতে পেরেছিল, তারা পূর্ব-পরিচয়ের ভিত্তিতে এই শক্তিকে চিহ্নিত করতে পেরেছিল। কারণ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, অন্য সাধনার থেকে এখানকার শর্তগুলি বেশ কঠিন এবং শ্রী অরবিন্দও বহুল প্রচারের প্রয়োজন বোধ করেননি। অতিমানসশক্তি ও তার অন্যান্য প্রকারভেদ — (যেমন Superman consciousness in 1st January 1969, এই শক্তির বিশেষ প্রয়োজনে অবতরণ ঘটেছিল 21st Feb 1972) পৃথিবীর পরিমণ্ডলের মধ্যে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল এবং এই প্রসঙ্গে আমাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পর্কে বলতে গেলে শ্রীমার সাধনা ও উপলব্ধির কথা এসে পড়ে। শ্রীঅরবিন্দ মানুষের অস্তিত্বকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন — মানসিক (mental), প্রানিক (vital), শারীরিক (physical)। মানুষের ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক পথযাত্রায় মানসিক একটা স্তর। সদ্য গুহায় পশুজীবন ফেলে এসে বিশ্লেষণ ক্ষমতা হাতে পেয়ে মানুষ খুশি। তাই নিয়ে তার সংসার যাত্রা। মানুষ জানতে শিখেছে প্রাকৃতিক শক্তিকে, কাজে লাগাতে চেয়েছে তাকে, গুহায় চলে না, বাসস্থান রচনার মনোনিবেশ। গাছের ছাল বড় রূঢ়, একে পরা যায় না, মসৃন কিছু পরিধেয় আবিষ্কার করে বৈজ্ঞানিকের অতন্দ্র সাধনার জীবনে যা করে তার মানসিক ব্যবহার এটা। প্রানিক দিকটা মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছা আগ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কে। মানসিকে ও প্রানিকে আবদ্ধ যে জীবন তা মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন। এ যেন পথ-যাত্রায় রাজপথ থেকে সরে এসে একটা গলিতে ঢুকে পড়ে অযথা সময় নষ্ট করা। কিন্তু শারীরিক তা নয়, শারীরিক যদি স্বাধীনভাবে চলে তার সঙ্গে শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক শক্তির যোগ থাকবে। মনুষ্য জীবনে শারীরিক উপরের দুটি ক্ষমতার দাসানুদাস হয়ে কাটাচ্ছে। তাকে মুক্ত করতে হবে, তবেই ঈশ্বরের সর্বোচ্চ চেতনা সোজাসুজি শারীরিক পেতে পারবে। তার জন্য তিনি জীবনের শেষের দিকে (১৯৬২-১৯৭২) সাধনায় যা লাভ করেছেন তা আমাদের জন্য রেখে গেলেন। তিনি দেখলেন শরীরের কোষ (cell) উচ্চতর শক্তিকে ধারণ করতে পারবে। শরীর কোষের জপের মন্ত্র তিনি দিয়ে গেছেন — শরীর কোষের প্রার্থনা :

১) "এখন দেখছি, ভগবানের দয়ায় আমরা ধীরে ধীরে নিশ্চেতনা থেকে বেরিয়ে এসে একটা সচেতন জীবনধারায় জেগে উঠছি। তাই একটা উদগ্র প্রার্থনা আমাদের ভিতর জেগে উঠছে অধিকতর আলো ও চেতনার জন্য।" (Ref : Collected works of the Mother - 11th Volume - Note, on the way Page 91)

"Now that, by the effect of the Grace, We are slowly emerging out of Incenscience and waking to a conscious life, an ordent prayer rises in us for more

light and consciousness. Oh, the Supreme Lord of the Universe, We implore Thee, give us Strength and beauty, the harmonius prefection needed to be Thy Divine instrument upon earth."

এই প্রার্থনা কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক থেকে বা হৃদয় থেকে উৎসারিত কোন প্রার্থনা নয়। এই প্রার্থনা আমাদের দেহ-কোষের (Cell)। মুস্কিল হচ্ছে এই দেহকোষ সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই। তার প্রার্থনা কীভাবে সম্ভব হবে। আপাততঃ কিছুটা দেহ-ব্যয়াম, যা পণ্ডিচেরীতে করা হয়, আর অভ্যাস — এই দুয়ের উপর নির্ভর করে দেখতে হবে কবে আমরা সেই আশীর্ব্বাদ পেতে পারি।

ঈশ্বরের সর্বোচ্চ-চেতনা সম্পন্ন শরীরে কোন ক্ষয় ক্লান্তি অক্ষমতা ভীতি থাকার কথা নয়। মানবিকচেতনসম্পন্ন শরীরে তা থাকে। তাই শরীরে কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, বিশৃঙ্খলা কখনো কখনো যন্ত্রণার আকার নেয়, কখনো সামান্য অস্বস্তির আকার, তখন সেই বিশৃঙ্খলা দূর করে সামঞ্জস্য আনার জন্য শরীর কোষের সাধনা সাধনা দরকার হয়। তাঁর মন্ত্র শ্রীমা দিয়েছেন, তাকে বলা হয় দেহ যোগ (Physical yoga)। এ জন্য শ্রীমার বাণী ঃ

"প্রতি মুহুর্ত্তে সমস্ত কোষ (Cell) হবে উর্দ্ধে উৎসর্গ করার এক নিশ্চল ভঙ্গি শ্রদ্ধাবনত আস্পৃহাযুক্ত, শ্রদ্ধা আর আস্পৃহা, শ্রদ্ধা... এছাড়া অন্য কিছু নয়। তারপর এক সময় আনন্দ আসবে আসবে স্বর্গীয় বিশ্বাস। যখন এই বিশ্বাস শরীর চেতনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবে তখন সব ঠিক হবে।" শ্রীমা এও বলেছেন "এটা বলা যত সহজ পালন তত সহজ নয়। তবে আপাততঃ এছাড়া অন্য পথও নাই।"

"At every second all the cells must be (gesture of motionless offering upward) in an adoration in an aspiration, an adoration an aspiration, an adoration ... and nothing else. Then after a time there is also deligat and then that ends in blissful trust." দৈহিক যোগের ক্ষেত্রে অসুবিধা সেই একই রকম, আমরা আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ কোষের খবর রাখি না। শ্রী অরবিন্দও এই দেহকোষের কথা বলেন নি। তিনি চৈত্যীকরণ (Psychicisation), আধ্যাত্মিকীকরণ (Spiritualisation) ও অতিমানসিকীকরণ (Supramentalisation) এর কথা বলেছেন। কিন্তু শ্রীমার দৈহিকযোগের কথা কিছু বলেননি।

শ্রীমা ঘটনাক্রমে সাধনার পথে মানসিক ও প্রানিক থেকে সরে আসেন। তিনি সরে আসেন ভুল বলা হল। তাঁর মানসিক ও প্রানিক শক্তির অবলুপ্তি ঘটানো হয়েছিল যার ফলে তিনি এক সময় মরণাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন, অন্ততঃ বাহ্য দৃষ্টিতে তাই। সেই সময় শ্রীমার প্রথম দুটি বাদ দিলে শুধু শারীরিক শক্তিটি পড়ে থাকে। শ্রীমার জীবনে তখন এলো শারীরিকের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ। তা ঘটে ১৯৬২ থেকে ১৯৭২ সাল পর্য্যন্ত। তখনো কিন্তু তাঁর শরীরের সব দেহ-কোষ বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। কিছু কিছু অধিক-অগ্রসর দেহকোষের সঙ্গে স্বল্প-অগ্রসর দেহকোষের অবস্থান হেতু দুই শ্রেণীর দেহকোষের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক মনোরম চিত্র তিনি দিয়েছেন।

মাঝে মাঝে আমাদের শরীরটা খারাপ মনে হয় এটা আমরা সকাল সন্ধ্যা অনুভব করি। এই চিন্তাটা অনগ্রসর দেহকোষের (unprepared cells)। তিনি বলেছেন আমাদের পূর্ব অনুমান একটা থাকে, যা অনগ্রসর দেহকোষেরই। হজম প্রক্রিয়া একটা বিশেষভাবে ঘটবে।

খাদ্য অঙ্গাঙ্গীকরণ সেও একটা বিশেষভাবে ঘটবে, রক্ত সঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ একটা বিশেষ ছন্দে চলতে থাকবে। এই সমস্ত ধারণা পূর্বতন অনগ্রসর দেহকোষের। অগ্রসর দেহকোষ এ সমস্ত কথা কিছুই ভাবে না। শ্রীমা তাঁর নিজের শরীরের মধ্যে লক্ষ্য করলেন কিছু কোষ বলছে আমাদের হজম ভালো হচ্ছে না। অন্য কোষ যাদের সাধনার পথে প্রস্তুতি আছে (Prepared cells) তারা বকুনি দিচ্ছে অনগ্রসর কোষগুলোকে ঃ "মূর্খ, কেন তুমি ভয় পাচ্ছ; ঈশ্বর (Divine) নিজেই তোমার শরীর চেতনায় রূপান্তরের জন্য এই ঘটনার সন্নিবেশ ঘটাচ্ছেন — এটা বুঝতে পারছো না।" অনগ্রসর দেহকোষ চুপ করে যায়। নিজেদেরকে ঈশ্বরের দিকে খুলে ধরে, অপেক্ষা করতে থাকে। পরে দেখা গেল বদ হজমজনিত পেটের অস্বস্তি চলে গেছে। (Ref. Note, on the way, p.-100)

শ্রী অরবিন্দ সাধনায় রূপান্তরের গুরুত্ব সবিশেষ। শ্রীমা দেহকোষের সাধনার ভিতর দিয়ে এক যুগান্তকারী ব্যবস্থাপনা দিয়ে গেছেন। এটা মানুষের শরীরকে নীরোগ রাখা বা দীর্ঘায়িত করার একটা সুযোগ দিচ্ছে। আসলে রোগ সম্পর্কে মানুষের মনের অন্ধ বিশ্বাসই যত নষ্টের গোড়া। শরীর মানসিক বা প্রানিকের দ্বারা প্রভাবিত না হ'লে সাধারণ সুস্থ জীবন নিয়ে সে চলতে থাকবে। দৈহিক যোগ নেই বিশ্বাস আনাতে পারে।

এরপর শেষের কথা একটু বলি। শ্রী অরবিন্দ ও শ্রীমার গুণমুগ্ধ আমি। তাঁদের দেখা পাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি সেটা আমার একটা দুর্ভাগ্য। ১৯৭২ সালে শ্রী অরবিন্দের শতবার্ষিকীতে তাঁর কিছু কিছু বই পড়তে গিয়ে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে যাই। এ কি অবদান, এ কি অমরত্ব পৃথিবীর মানুষের জন্য তিনি রেখে নিশ্চুপে সকলের অগোচরে অনেক অনবধানতায় পৃথিবী থেকে সরে গেলেন। শ্রী অরবিন্দ অবশ্য নিজের প্রচার চাননি। শিষ্যদের মধ্যে এটা প্রচারিত ছিল।